আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

করোনা যুদ্ধের রূপকল্প

বিশ্ব জুড়ে অভাবনীয় এক সংক্রমণ সন্ত্রাস চলছে। জিম্মি হয়ে পড়েছে পৃথবী নামক এই গ্রহ। সন্ত্রাসী অতি ক্ষুদ্র একটি ভাইরাস যার নথিভূক্ত নাম কোভিড-১৯। টার্গেট এই গ্রহের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রানী, আশরাফুল মাখলুকাত, হোমো স্যাপিয়েন্স বা মানুষ। জল-স্থল জয় করে মানুষ বর্তমানে আকাশ বিজয়ে যাচ্ছে। তারা নিজেদের অপ্রতিরোধ্য ভাবতে শুরু করেছিলো। অথচ চোখে দেখা যায় না, এমনকি সাধারণ অনুবীক্ষনযন্ত্রেও দেখা যায় না, এত ক্ষুদ্র একটি ভাইরাসের আক্রমণ তাদের থামিয়ে দিয়েছে।তারা দিশেহারা হয়ে সেই আকাশের কাছে আত্মসমর্পণ করছে। শুধু ধর্মীয় নেতারা নন, কয়েকদিন আগে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত সমাধান শেষ হয়ে গেছে, এখন একমাত্র সমাধান আকাশের কাছে। তবে বাংলাদেশের মানুষ এখনো মনে করে না পার্থিব সব সমাধান শেষ হয়ে গেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যুদ্ধ করতে হবে। সমাধান খুঁজে বের করতে হবে, তাই ভাবতে বসেছি। আমার মনে হয়, প্রথমেই যুদ্ধের সঠিক রূপকল্প দরকার। এখন কোথায় আছি, আগামী ছয় মাস পর কোথায় থাকবো, দীর্ঘ মেয়াদী রণ-কৌশল দরকার। একাত্তরের সাতই মার্চে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার যে নির্দেশনা ছিল, বর্তমান যুদ্ধে তা কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তা অনুধাবন করা দরকার।

বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ফেব্রুয়ারী থেকেই কোভিড-১৯ সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করে। বাংলাদেশে ৮ মার্চ প্রথম ইতালী ফেরত দুই প্রবাসী এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর জানা যায়। ১৪ মার্চ জানা যায় প্রথম মৃত্যুর সংবাদ। ২৩ মার্চ জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) জানায় রোগটি এখন আর বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের মধ্যে সীমিত নেই, কমিউনিটি সংক্রমণ হচ্ছে। এর পর ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংক্রমণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সবাইকে ঘরে থাকতে বলা হয়, শুরু হয় দেশ ব্যাপী লক ডাউন। তবে স্বল্প আয়ের খেটে খাওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরে না থেকে রওনা হয়ে যান নিজ নিজ এলাকার উদ্দেশ্যে। কিছু বিশেষজ্ঞ এতে শংকা প্রকাশ করেন, যেহেতু কমিউনিটি সংক্রমণ হচ্ছে, তাহলে কি এই ঘরমুখী মানুষগুলো প্রাণঘাতি ভাইরাসটিও সাথে নিয়ে গেল! এর পর সারা দেশ ব্যাপী বিচ্ছিন্ন সংক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তবে পরীক্ষার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকায় প্রতিদিন ঠিক কত লোক আক্রান্ত হচ্ছেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আগামী ৪ এপ্রিল পর্যন্ত অফিস আদালত, যানবাহন সব বন্ধ যেটি ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

সবাই শংকিত, ১১ এপ্রিলের পর ঢাকা পরিণত হতে পারে সর্ববৃহত রণাঙ্গনে, যখন স্বল্প আয়ের লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষ রাজধানীতে ফিরবেন। যানবাহন চলাচল শুরু হবে, অফিস আদালত কল-কারখানা চালু হবে। কমিউনিটি সংক্রমণ আরো প্রকাশ্যে আসবে। নীতি নির্ধারকদের ও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের হাতে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত সময় থাকলেও এখন পর্যন্ত ভাইরাস বিরোধী যুদ্ধের দীর্ঘ মেয়াদি কোন পরিকল্পনা প্রতীয়মান হচ্ছে না। পিসিআর টেস্ট সেন্টার আরো বাড়ানো হচ্ছে, তবে বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় তা অপ্রতুল। কেবল মাস্ক পরা, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার প্রচারণা বারবার ভেসে উঠছে টেলিভিশনে, স্যোসাল মিডিয়ায়। ওদিকে অধিকাংশ খেটে খাওয়া মানুষের সামান্য সঞ্চয় ফুরিয়ে

যাচ্ছে। তাঁরা অধীর আগ্রহে সবকিছু সচল হবার অপেক্ষায় আছেন।

শুরুতেই দেখা যাক কোভিড-১৯ ভাইরাসটির আকৃতি ও গঠন সম্পর্কিত কিছু তথ্য যা যুদ্ধে জেতার জন্য সহায়ক। মুকুট আকৃতির এই আরএনএ ভাইরাস একটি তৈলাক্ত (লিপিড) আবরণে মোড়ানো, যে কারণে সাবান দিয়ে হাত ধুলে ভাইরাসটিকে ধুয়ে ফেলা যায়। তৈলাক্ত পদার্থ, যেমন নারকেল তেল, শীতকালে (ঠান্ডায়) জমে যায় যা তাপ দিয়ে গলানো যায়। এই ভাইরাসটির তৈলাক্ত আবরণ তেমনি গরম আবহাওয়া গলে না গেলেও দুর্বল হয়ে পড়ে। জাপানে ইদানিং গরম পড়ছিল। তবে ২৮ মার্চ রবিবার একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হবার ফলে টোকিওতে অসময়ে হঠাৎ তুষারপাত ঘটে, শীত পড়ে। ঐ দিন টোকিওতে ৬৮ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, যা এ পর্যন্ত একদিনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আক্রান্তের সংখ্যা। এই ঘটনা ইঙ্গিত করে ভাইরাসটি শীতে শক্তিশালী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অবশ্য সতর্ক করেছে, ঠান্ডা কিংবা গরম দুই আবহাওয়াতেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা রাখে। ছড়িয়ে পড়ার অর্থ প্রকৃতিতে কিংবা মানবদেহে সক্রিয় থাকার ক্ষমতা। জানা গেছে, প্রকৃতিতে এটা কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন বেঁচে থাকে। মানুষের শরীরে প্রবেশের পর রোগের কোন লক্ষন বা উপসর্গ না থাকলেও এই ভাইরাস বারো দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। এটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুমান, কারণ এই সংখ্যার সাথে আরো দুইদিন যোগ করে, ১৪ দিনের কোয়ারেন্টিন ধার্য করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক জনস্বাস্থ্য বিশারদ পূর্বাভাস দিয়েছেন, করোনা বিপর্যয় কাটাতে পুরো গ্রীস্মকাল বা আরো বেশী সময় লাগতে পারে। এই বক্তব্য আমলে নিয়ে, আমরা স্বদেশে করোনা মোকাবিলা করার সময় সীমা সম্পর্কে একটা হিসাব দাঁড় করাতে পারি। দেশে নভেম্বর মাস পর্যন্ত গরম পড়ে। কিছুটা কাকতালীয় হলেও বিষয়টা তাহলে কি দাঁড়ালো? স্বাধীনতা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরে বলেছেন করোনা সংকট থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে হবে। আর সময়ের হিসাবে মহান মুক্তিযুদ্ধেরর মতোই নয় মাসে, অর্থাৎ আগামী শীতে ভাইরাসটি আবার শক্তি সঞ্চয় করার আগে, এই শত্রুর কবল থেকে দেশকে মুক্ত করত হবে। সেই অর্থে এটি আমাদের জন্য আর একটি মুক্তিযুদ্ধ । মুজিব জন্মশতবর্ষেই আমাদের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।

প্রস্তুতির জন্য শত্রুর আক্রমণ ক্ষমতা নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জেনে রাখা দরকার। করোনা ভাইরাস বলতে একটি শ্রেণীকে বোঝায় যার অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে। তার একটি হচ্ছে বর্তমান শত্রু, কোভিড-১৯। কিছু কিছু করোনা ভাইরাস মানবদেহের শ্বাসযন্ত্রের উপরের দিক অর্থাৎ শ্বাসনালী বা গলা দিয়ে ঢুকে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কোভিড-১৯ সাধারণত শরীরে ঢোকে শ্বাসযন্ত্রের নীচের দিক অর্থাৎ ফুসফুস দিয়ে। আমাদের নিশ্বাসের সাথে, ভাইরাসটি কি সরাসরি ফুসফুসে চলে যায়? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যায় না। নাক দিয়ে ঢুকে, শ্বাসনালী দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফুসফুস পর্যন্ত বাতাস পৌঁছাবার পথটি সোজা নয়, বাঁকানো। অর্থাৎ নিশ্বাসের সাথে নাক বা মুখ দিয়ে ভাইরাস ঢুকলেও তার অধিকাংশ ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছাবার আগেই আটকা পড়ে শ্বাসনালীতে। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায়, শাসনালী ও খাদ্যনালীর সংযোগ স্থান যেটাকে আমরা গলা বলি, সেখানে। নাক, মুখ কিংবা চোখ যেদিকে দিয়েই ভাইরাস ঢুকুক না কেন, গলা দিয়ে যেতে হবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

স্বল্প জনসংখ্যার দেশ আইসল্যান্ড, সকল দেশবাসীর উপর করোনা টেস্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। থ্রোট সোয়াব অর্থাৎ গলার ভেতরের দিক থেকে সংগ্রহ করা শ্লেষ্মার নমুনা নিয়ে সেই পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যন্ত সে দেশে ২১৮ জন করোনা পজেটিভ কেস পাওয়া গেছে যার অর্ধেকের রোগের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ ছিল না। জাপানের ইয়োকোহামা বন্দরে কোয়ারেন্টিন করে রাখা প্রমোদ তরী ডায়মন্ড প্রিন্সেস এর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে থ্রোট সোয়াব পজেটিভ কেস এর একটা উল্লখেযোগ্য অংশের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ ছিলনা। মানে কি দাঁড়ালো? গলায় করোনা ভাইরাস নিয়ে আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ কিছু লোক সমাজে অবাধে ঘুরে বেড়াবে কিন্তু শনাক্ত হবে না। অথচ তাদের সংস্পর্শে যারা আসবে তাদের মধ্যে অর্ধেক লোক রোগে আক্রান্ত হবে আবার বাকী অর্ধেক আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ অবস্থায় গলায় করোনা ভাইরাস নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। বোঝা যাবে না, কার সংস্পর্শে আসার কারণে সংক্রমণ ঘটলো। এটাই কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের স্বরূপ। পরীক্ষা না করা পর্যন্ত বোঝা যাবে না কে করোনা ভাইরাস মুক্ত, কে আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ ক্যারিয়ার আর কে প্রকৃত রোগী।

বিশ্বের স্বনামধন্য রোগতত্ত্ববিদরা বলছেন কোভিড-১৯ এত ছোয়াছে যে কমপক্ষে পৃথিবীর ৬০% মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হবে। তবে যেসব দেশে পর্যাপ্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই অর্থাৎ ভাইরাস মুক্ত মানুষ, ক্যারিয়ার ও রোগীদের পরীক্ষা মাধ্যমে শনাক্ত করে আলাদা করার সুব্যবস্থা নেই, সে সব দেশে আক্রান্ত হবে ৮০% মানুষ। অত্যন্ত ঘণবসতি হওয়ায়, আমাদের দেশে প্রায় সবাইকেই কোন না কোন এক সময়ে আক্রান্ত হবার মতো অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হবে। তবে আশার কথা, আক্রান্ত জনসংখ্যার অধিকাংশ দৃশ্যতঃ সুস্থ থাকবেন।

তবে কে আক্রান্ত হয়েও দৃশ্যতঃ সুস্থ থাকবেন আর কে শয্যাশায়ী হবেন, তা নির্ভর করবে দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর। এক কথায় যাকে বলা হয় অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ প্রতরোধ করতে আমাদের দেহে কয়েক স্তরের ইমিউনিটি ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এর কিছু অফেন্স ও কিছু ডিফেন্স ভিত্তিক। মানবদেহে ইমিউনিটির প্রধান দায়িত্ব পালন করে রক্তের শ্বেত কণিকা সমূহের একটি বিশেষ কোষ যার নাম লিম্ফোসাইট। মোটা দাগে এই লিম্ফোসাইট দুই গোত্রের হয়, টি-লিম্ফোসাইট ও বি-লিম্ফোসাইট। দুই গোত্র দুই ধরণের প্রতরোধ নিশ্চিত করে। টি-লিম্ফোসাইট সরাসরি ভাইরাসগুলো মেরে ফেলার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, একই সাথে বি-লিম্ফোসাইটকে সাহায্য করে। অপরদিকে বি-লিম্ফোসাইটগুলো সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ন না হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি নিঃসরণ করে, যে গুলো ক্ষেত্র বিশেষে অফেন্স কিংবা ডিফেন্স এর দায়িত্ব পালন করে। বি-লিম্ফোসাইট পাঁচ ধরণের অ্যান্টিবডি নিঃসরণ করতে পারে, যেগুলোর নাম- আইজি-এ, আইজি-এম, আইজি-জি, আইজি-ই এবং আইজি-ডি। কোভিড-১৯ প্রতরোধে এই পাঁচ ধরণের অ্যান্টিবডির মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে তিনটি, আইজি-এ, আইজি-এম এবং আইজি-জি। যে কোন ভাইরাস দেহে সংক্রমণ ঘটালে লিম্ফোসাইটের সংখ্যা কমে যায়, কারণ ভাইরাস মাত্রই জানে যে মানব দেহের ভিতরে সংক্রমণের প্রধান অন্তরায় লিম্ফোসাইট।

আগে বলেছিলাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ প্রথমে গলায় আটকে যায়। বস্তুত ভাইরাসের বিরুদ্ধে মানব দেহযন্ত্রের যুদ্ধ এখান থেকেই শুরু। আমাদের শরীরের বাইরের আবরণ হচ্ছে ত্বক বা

চামড়া। আর নাক-মুখ, চোখের পাতার ভিতরের দিক, শ্বাসনালী, খাদ্যনালী অর্থাৎ গলার ভিতরের আবরণকে বলা হয় শৈষ্মিক ঝিল্লি বা মিউকাস মেমব্রেন। মিউকাস মেমব্রেন সাধারণ অবস্থায় আদ্র থাকে কারণ, মিউকাস মেমব্রেনের কিছু কোষ ক্রমাগত মিউকাস বা পিচ্ছিল শ্লেষ্মা নিঃসরণ করে মেমব্রেনের উপরে একটা পাতলা আবরণ তৈরী করে। এই রক্ষক আবরণে আইজি-এ অ্যান্টিবডি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে আইজি-এ গুলি কোভিড-১৯ এর জন্য সুনির্দিষ্ট না হলেও এর উপস্থিতি ভাইরাস বা ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে বৈরী পরিবেশ তৈরী করে রাখে। কোভিড-১৯ প্রতিহত করার জন্য আমাদের নিশ্চিত করতে হবে মিউকাস মেমব্রেনের উপরের পিচ্ছিল আবরণ যেন আদ্র ও অটুট থাকে। সে জন্য পর্যাপ্ত পানি বা তরল পদার্থ পান করা আবশ্যক। তবে খুব বেশী গরম বা ঠান্ডা পানীয় বর্জনীয়। সেই সাথে দেহের ইমিউনিটিকে শক্তিশালি রাখতে খাদ্যাভাসে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। আমিষ, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবারকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন লেবু, আমলকী, কমলা, সবুজ মরিচ, গাজর, পালংশাক, ডিম, চিনাবাদাম ইত্যাদি। জীবন যাপনে নিয়ম ও ভারসম্য আনতে হবে। আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি মানসিক চাপ বা স্ট্রেস কমাতে হবে। স্ট্রেস দেহের ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয়।

আমরা এখন মাস্ক পরছি, নিয়মিত সাবান দিয়ে হাত ধুচ্ছি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখছি। এগুলো ভাইরাসের বিরুদ্ধে এক ধরণের আত্মরক্ষামূলক চর্চা বা ড্রিল। এই চর্চার ফলে সামান্য কিছু করোনা ভাইরাস নাক-মুখ দিয়ে ঢুকলেও, সম্ভবত স্থানীয় ইমিউন সিস্টেম দ্বারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে, ফুসফুস পর্যন্ত যেতে পারবে না। এর সাথে আরো দুটো ড্রিল যোগ করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ঘরের তাপমাত্রায় রাখা পানিতে এক চিমটি লবন গুলিয়ে গড়গড়া করা। দ্বিতীয়ত, সকালে ঘুম থেকে উঠে দশ মিনিট শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা রিদমিক ব্রিদিং এক্সারসাইজ করা। আরাম করে বসে বা দাঁড়িয়ে এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত গুনতে গুনতে গভীর ভাবে নিঃশ্বাস নিয়ে গভীর ভাবে শ্বাস ছাড়তে হবে। এতে ফুসফুসে রক্ত চলাচল বাড়বে, শ্বাসনালীর নিচের দিকে যে শ্লেষ্মা নিঃসরণ হতে থাকে তা উপরের দিকে অর্থাৎ গলার দিকে উঠে আসার হালকা প্রবাহ তৈরী হবে। গলা থেকে যে কোন রোগজীবানু নীচের দিকে, ফুসফুসে নামতে বাধাপ্রাপ্ত হবে। মুখের লালা, নাকের পানি, চোখের পানি বা শ্বাসনালীর শ্লেষ্মা, সবই কিন্তু আজান্তে খাদ্যনালী দিয়ে পাকস্থলীতে চলে যায়। কিছুকিছু ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ পাকস্থলী দিয়েও আক্রমণ চালাতে পারে, তবে এর মূল টার্গেট যেহেতু ফুসফুস, তাই এই শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়ামটি ফুসফুসের ক্রিয়াকে শক্তিশালি রাখবে যা করোনা যুদ্ধে সহায়ক। এই ড্রিল, সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেও চালু করা যায়। জাপানের অনেক অফিসে সকালে কাজ শুরু করার আগে সবাই এধরনের হালকা ব্রিদিং এক্সারসাইজ করে নেয়। সামাজিক মাধ্যম, যেমন টেলিভিশনেও ড্রিলটি চালু করা যেতে পারে।

ইমিউন সিস্টেম বা ফুসফুস শক্তিশালি করা কিন্তু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার প্রাক-প্রস্তুতি। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রথমে দেহে দেহে দুর্গ গড়ে তোলা। তবুও এই দেহ-দুর্গের কোন দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, ফুসফস আক্রমণ করার চেষ্টা করবে কোভিড-১৯, যা তৎক্ষনাত মোকাবিলা করবে দেহের ইমিউনিটি ব্যবস্থা। টি-লিম্ফোসাইট সরাসরি ভাইরাস খতম করার লড়াইয়ে (অফেন্স) অবতীর্ণ হবে। আর বি-লিম্ফোসাইট কোভিড-১৯ মেরে ফেলার জন্য এবারে সুনির্দিষ্ট তিনিটি অ্যান্টিবডি নিঃসরণ শুরু করবে, আইজি-এ, আইজি-এম এবং আইজি-জি। ফুসফুস আক্রান্ত হবার পাঁচদিনের মাথায় শুরু হবে সুনির্দিষ্ট

আইজি-এ, আইজি-এম নিঃসরণ। এর মধ্যে অধিকাংশ পরিমান আইজি-এ রক্ত সঞ্চালন থেকে বের হয়ে চলে যাবে গলা সহ শরীরের ভিতরের বিভিন্ন স্থানের মিউকাস মেমব্রেনর উপরের আবরণে। এগুলো সুনির্দিষ্ট আইজি-এ তাই সরাসরি কোভিড-১৯কে আক্রমণ করবে।

সুনির্দিষ্ট আইজি-এ মিউকাস মেমব্রেনে চলে গেলেও বি-লিম্ফোসাইট থেকে নিসৃত হওয়া সুনির্দিষ্ট আইজি-এম রক্তেই থেকে যাবে। ফুসফুস অসংখ্য ক্ষুদ্র বায়ুথলি দিয়ে গঠিত যার গায়ে রয়েছে অতিসুক্ষ কৌশিকনালীর জালিকা। এই জালিকা দিয়ে রক্ত চলাচল করে। জালিকার রক্ত প্রবাহে অবস্থান নেওয়া আইজি-এম রক্তপ্রবাহে কোভিড-১৯ ঢুকলেই সেগুলোকে আক্রমণ করবে, এটা হবে আর এক রণাঙ্গন। মানব দেহযন্ত্র তো গাড়ীর ইঞ্জিনের মতো। গাড়ী স্টার্ট দিয়ে হাই স্পীডে যাওয়া পর্যন্ত কিছুটা সময় লাগে। ইঞ্জিনের যদি টার্বো সাপোর্ট থাকে তাহলে নিমেষে গাড়ী হাই স্পীডে উঠে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানব দেহযন্ত্রের জন্যও এই টার্বো সাপোর্টর প্রয়োজন পড়ে। যেমন কোভিড-১৯ এর তড়িৎ আক্রমণ। এই শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য দেহকে নিমেষে হাই স্পীডে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আর দ্রুত স্পীড উঠানোর ক্ষমতা নির্ভর করবে দেহের সার্বিক প্রস্তুতির উপর। দেহযন্ত্র প্রস্তুত থাকলে পঞ্চম দিন থেকেই কোভিড-১৯ যুদ্ধে হারতে থাকবে, যার ফলে সংক্রমণের উপসর্গ হবে যৎসামান্য। বা আপাত সুস্থ ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে আদৌ কোন উপসর্গ দেখা দেবে না।

আক্রান্ত হবার চৌদ্দদিনের মাথায় কোভিড-১৯ প্রতিহত করার জন্য বি-লিম্ফোসাইট সুনির্দিষ্ট তৃতীয় অ্যান্টিবডি, আইজি-জি রক্তে নিঃসরণ করা শুরু করবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক হয় না। আইজি-জি নিঃসরণ বৃদ্ধির সাথে সাথে আক্রান্ত ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবেন। আবার আইজি-জি নিঃসরণ বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে আইজি-এম কমতে কমতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। আইজি-জি অনেক দিন রক্ত প্রবাহে থেকে যাবে। যে বি-লিম্ফোসাইটগুলো সুনির্দিষ্ট আইজি-জি নিঃসরণ করেছিল, সেগুলো প্রক্রিয়াটি তাদের মেমরীতে রেখে দেবে। সে কারণেই কোন ব্যক্তি একবার কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হবেন না। একে বলা যায় সংক্রমণের কারণে, ‘অর্জিত সক্রিয় ইমিউনিটি’ । তবে কোন কোন ভাইরাসের ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, যেমন ক্রনিক হেপাটাইটিস সি। কোভিড-১৯ সংক্রমণের ক্ষেত্রে এমনকি যারা আক্রান্ত অথচ উপসর্গহীন তাদের রক্তেও চৌদ্দদিন পরে সুনির্দিষ্ট আইজি-জি নিসৃত হবে, ফলে তিনিও ভাইরাস মুক্ত হবেন এবং অর্জিত সক্রিয় ইমিউনিটি দ্বারা সুরক্ষিত থাকবেন। যারা মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান, বর্তমানে কোভিড-১৯ এ একেবারেই সংক্রমিত হবেন না, পরবর্তীতে টিকা আবিষ্কৃত হলে, সেই টিকা নিয়ে তারা একই ভাবে রক্তে তৈরী হওয়া আইজি-জি থেক সুরক্ষা পাবেন। সেক্ষেত্রে অর্জিত বলা যাবেনা, সেটা ‘আরোপিত সক্রিয় ইমিউনিটি’ ।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে সেরে ওঠার ক্ষেত্রে দেহজাত এই প্রতিরোধের বাইরে কার্যকর তেমন কোনো ওষুধ নেই। হালকা ভাবে আক্রান্ত হলে হোম আইসোলেশনে রেখে সেবা-শুশ্রষা করতে হবে। উপসর্গ ভিত্তিক চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে। জ্বর ও গলাব্যাথার জন্য অ্যান্টি-পাইরেটিক (যেমন নাপা এইস ট্যাবলেট) ও অ্যান্টি-হিস্টামিন (যেমন এলাট্রল) গ্রুপের ওষুধ। বেশী জ্বর (১০২ ডিগ্রী বা অধিক) উঠলে সাথে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট শুরু হলে দ্রুত নিকটস্থ যে হাসপাতালে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রুগী ভর্তি নেয় সেখানে যেতে হবে। আর সংস্পর্শে আশা সবাইকে হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের বৈশ্বিক মৃত্যুর হার ৩.৪%, যদিও রোগী হিসাবে যাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এটা তাদের হিসাব। হালকা উপসর্গ নিয়ে সেরে ওঠা রোগী বা উপসর্গহীন ক্যারিয়ার যারা রোগীর হিসাবে তালিকায় নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করেন নি, তারা এ হিসাবের বাইরে। বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার বৈশ্বিক মৃত্যুর হার আবার দেশ ভেদে ভিন্ন। উন্নত দেশে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা আছে বিধায় সে সব দেশে মৃত্যুর হার তুলনামূলক বিচারে কম হওয়ার কথা। তবে কোভিড-১৯ দ্রুত গতিতে আক্রমণ করে এবং বয়স্কদের দেহযন্ত্রে টার্বো ক্ষমতা সীমিত থাকায় তারা অধিক ঝুঁকিতে থাকেন। সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় অনেক উন্নত দেশেও করোনা মহামারি শুরু হয়েছে। যেমন, ইতালিতে কোভিড-১৯ এ আক্রান্তদের মৃত্যুর হার ১০% যা আরো বাড়ার আশংকা আছে। আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা কি সেটা বর্তমান দেশব্যাপী লকডাউনের মধ্যে বলা মুশকিল। তবে রোগটি বর্তমানে কমিউনিটি সংক্রমণ পর্যায়ে আছে, সময়োচিত সঠিক পদক্ষেপ নিলে পরবর্তী ভয়াবহ স্তর, মহামারি বা মড়ক ঠেকানো যাবে। আমাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ কি, সেটা নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে তিন ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য।

চাইনিজ লকডাউন শুরু হয় ২৩ জানুয়ারি থেকে হুবেই প্রদেশের উহান সহ ১৬টি শহরে যেখানে কোভিড-১৯ মাহামারি আকার ধারণ করেছিলো। ডিসেম্বর থেকে উহান শহর থেকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ শুরু হলে চীন প্রথমে কেস আইসোলেশন/ট্রিটমেন্ট ও কন্টাক্ট ট্রেসিং/কোয়ারেন্টিন পদ্ধতি শুরু করলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে। লকডাউন ছাড়া উপায় থকেনি। লকডাউনের ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে এবং ৮ এপ্রিল থেকে উহান শহরে আংশিকভাবে লকডাউন উঠে যাচ্ছে। তবে উহান থেকে কোভিড-১৯ সংক্রমণ চীন সহ সারা বিশ্ব ছড়িয়ে পড়লেও রাজধানী বেইজিং কিংবা অর্থনৈতিক রাজধানী সাংহাই লকডাউন করার মত পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হয়নি।

দক্ষিন কোরিয়ান ট্রেস-টেস্ট-ট্রিট, যেখানে সুস্থ কিংবা আক্রান্ত, সবাইকে ব্যাপক ভাবে শনাক্ত, পরীক্ষা ও চিকিৎসা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা গেছে। এখন পর্যন্ত দেশটি ৩ লাখের বেশি মানুষকে পরীক্ষা করেছে, প্রতিদিন বিনামূল্যে ১৫ হাজার লোকের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এটা পেরেছে, কারণ ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাপী আর এক করোনা ভাইরাস, মিডলইস্ট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম (মার্স) ছড়িয়ে পড়লে দক্ষিন কোরিয়ায় সাতশোরও বেশি স্কুল বন্ধ করে দিতে হয়, ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি হয়। সে সময়ে ছয়টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রিয়্যাল-টাইম রিভার্স-ট্রান্সক্রিপশন পলিমেরেজ চেইন রিঅ্যাকশন (আর-আরটিপিসিআর) পরীক্ষার ভিত্তিতে আরএনএ ভাইরাস শনাক্তকরণ কিট তৈরি করার অনুমতি দেওয়া হয়। সেই প্রেক্ষাপটে কোভিড-১৯ শনাক্ত করার ক্ষেত্রে দক্ষিন কোরিয়া অনেক এগিয়ে আছে এবং লকডাউন এড়াতে পারছে।

বৃটিশ হার্ড (HERD) ইমিউনিটি (ধীরে চলো) কৌশল। প্রথেম জেনে নেই হার্ড ইমিউনিটি কি। একটু আগে, ইমিউনিটি ব্যাখ্যা করেছিলাম। কোন জনগোষ্ঠীর ৬০% মানুষের যখন কোন সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে সক্রিয় ইমিউনিটি থাকে তখন সেটাকে হার্ড ইমিউনিটি বলা হয়। ভাইরাসের বিরুদ্ধে

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

৬০% মানুষকে টিকা প্রদান করলে সেটা হবে আরোপিত সক্রিয় হার্ড ইমিউনিটি। তবে, কোভিড-১৯এর টিকা এখনো তৈরী হয়নি (চেষ্টা চলছে)। তাই বৃটেন প্রথমে বেছে নিয়েছিলো অর্জিত সক্রিয় হার্ড ইমিউনিটির পথ। অর্থাৎ একটা সময় পর্যন্ত বিক্ষপ্ত সংক্রমণ চলতে থাকবে, এভাবে পর্যায়ক্রমে দেশের ৬০% মানুষ সংক্রমিত হলে অর্জিত সক্রিয় ইমিউনিটির মাধ্যমে হার্ড ইমিউনিটি নিশ্চিত হবে। শীত প্রধান দেশ যেমন বৃটেন, ইউরোপিয় দেশ সমূহ বা যুক্তরাষ্ট্রে, শীতকালে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জাও আরএনএ ভাইরাস (যদিও করোনা গোত্রীয় নয়)। এটা অনেক সময় জনজীবন বিপর্যস্ত করে, স্কুল-কলেজ বন্ধ করায়। তবে, গরম পড়লে এটা কমে যায়, আর ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্তদের মাত্র ০.১% মার যায়। উহান থেকে যখন কোভিড-১৯ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া শুরু করে, তখন ইউরোপ-আমেরিকার রোগতত্ত্ব বিশারদরা সেটাকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতোই হালকা ভাবে নিয়েছিলেন। ফলে, সবাই মাস্ক পরা বা সামাজিতক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম না মেনে, পানশালায়-কফি শপে গিয়ে মদ-গাঁজা খেয়েছে। নেদারল্যান্ডে গাঁজা নিষিদ্ধ নয় বিধায় কফি শপে গাঁজা বিক্রি হয় এবং এই দেশটিও প্রথমে অর্জিত সক্রিয় হার্ড ইমিউনিটি অর্জন করার পথ বেছে নিয়ে এখন সমস্যায় পড়েছে। ভয়ংকর ছোঁয়াচে এবং বয়স্কদের জন্য মারাত্মক কোভিড-১৯ ইতালি, স্পেইনকে ধরাশায়ী করার পর রোগতত্ত্ব বিশারদদের টনক নড়ে। ততদিনে কফিনের মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, অর্থনীতি দেউলিয়া হবার প্রান্তে। অবশেষে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র লকডাউন শুরু করেছে, ইউরোপের অন্যান্য দেশও পূর্বের কৌশল পাল্টাচ্ছে। শুধু তাই নয়, উহানে যখন ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাপ-বাদুড় খেকো চীনাদের নিয়ে ক্যারিকেচারে ভরে গিয়েছিলো বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-সম্পদে এগিয়ে থাকা ইউরোপ-আমেরিকার স্যোসাল মিডিয়া। যেই চীন ধাক্কা কাটিয়ে উঠছে এখন সেই স্যোসাল মিডিয়া নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্বে সয়লাব।

আমি সামান্য মানুষ, প্রবাসী গবেষক, চিকিৎসক ও সমাজ সংগঠক। নব্বই ও তার পরের দশকে, টোকিওর নিহন বিশ্ববিদালয় ও বংগবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ভাইরাল হেপাটাইটিস এর রোগতত্ত্ব নিয়ে কাজ করেছি স্বনামধন্য গ্যাস্ট্রো-এন্টারোলজিস্ট, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান স্যারেরে সাথে। ঢাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করতে হয়েছে। আরএনএ আইসোলেসন, আরটি পিসিআর, ইন-সাইটু হাইব্রিডাইজেশন থেকে শুরু করে ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি টেকনিক শিখতে হয়েছে, নিজে করতে হয়েছে। জার্নালে পাবলিকেশন আছে। নব্বইয়ের দশকে পিসিআর কিট তেমন পাওয়া যেত না, দাম ছিল অনেক। প্রাইমার/প্রোবের ডিজাইন নিজেদের করতে হতো। সংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করার পর বর্তমানে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগ নিয়ে কাজ করছি। স্থায়ী নিবাস টোকিও তবে মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের হেলথকেয়ার ম্যানেজমেন্টেএর জন্য বর্তমানে ঢাকায় আছি। আজ (২ এপ্রিল) একটি চার্টার বিমান ঢাকা এসে অধিকাংশ জাপানী ও আমার মতো জাপান প্রবাসীদের টোকিওতে ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমিও ফিরে যাবার আহবান পেয়েছি। কিন্তু মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে, সেখানে জাপানীরা সহ অনেকে বিদেশী রয়ে গেছেন। তাই টোকিওতে ফিরে যেতে মন চাইলেও কর্তব্যের প্রয়োজনে ঢাকাতেই থেকে যাচ্ছি। নিজের কি হবে জানি না, তবে আল্লাহ না করুক মাতারবাড়িতে যদি কোন কেস শনাক্ত হয়, বিদেশীদের জন্য সরকার আলাদা কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা জানার জন্য এখানে ওখানে যোগাযোগ চেষ্টা করেও এগোতে পারছি না। অগত্যা এই লেখাটা নিয়ে বসেছি, যতই লিখছি শেষ হচ্ছে না, দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

প্রসঙ্গে আসি, আমাদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ। আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায়, যে তিন ধরণের পদক্ষেপের বিষয়ে এতক্ষন আলোচনা করলাম, দেশের প্রেক্ষাপটে তার কোনটা প্রযোজ্য। আমার মতে তিনটি পদক্ষেপই জরুরী, তবে তার জন্য একটা রূপকল্প থাকতে হবে। একটা উন্নয়নশীল দেশে লাগাতার লকডাউন কোন টেকসই সমাধান নয়, আবার এটাকে বাতিলও করা যাবে না। লকডাউন চলবে, তবে তা নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা ও সময়ের ছকে বেঁধে নিয়ে খন্ডখন্ড ভাবে। যুদ্ধ একটাই, রণাঙ্গন অনেক ও আকস্মিক করতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা অপারেশনের মতো। যেখানে শত্রু সেখানেই আঘাত, হোম আইসোলেশন, কোয়ারেন্টিন, অল্প কিছুদিন পর লকডাউন প্রত্যাহার। প্রশ্ন উঠবে সুনির্দিষ্ট টেস্ট ছাড়া করোনা কেস কিভাবে শনাক্ত হবে। প্রাথমিক ভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে না, তবে কন্টাক্ট টেসিং ও প্রধান উপসর্গগুলোর উপরে ভিত্তি করে চেষ্টা করতে হবে, সেই ঐতিহাসিক নির্দেশনা অনুযায়ী, যার যা আছে তাই নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। যেমন, রোগীর সংস্পর্শে আসা, জ্বরের মাত্রা, শুকনো কাশি, শ্বাস-কষ্ট এবং অন্য কোন উপসর্গ আছে কিনা এধরণের প্রশ্নমালার সাথে সমন্বয় করে মোবাইল এ্যাপ্ তৈরীর করা যেতে পারে। দক্ষিন কোরিয়া ট্রেসিং এর ব্যাপারে খুবই আগ্রাসী পদ্ধতি অবলম্বন করছে। সিসি ক্যামেরা ফুটেজ, মোবাইল ও গাড়ীর জিপিএস ট্রাকিং, ক্যাশ/ক্রেডিট কার্ডের লেন-দেন সবই নজরদারি করছে। ব্যক্তিগত মানবাধিকার লঙ্ঘণ বলে আপত্তি উঠলেও সংকটের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এগুলো থামানো হয় নি।

আমাদের এখানে সরকারি হিসাবেই, গত দুই মাসে চীন-ইতালি সহ ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে সাড়ে ছয় লাখের মতো প্রবাসী দেশে এসেছেন। তাদের অনেকে কোনো পরীক্ষা ছাড়াই ঢাকায় বিমানবন্দর পার হয়ে গেছেন। এদের নিবিড় ভাবে ট্রেসিং করা যায় কিনা ভেবে দেখতে হবে। পাশাপাশি ঘরে বসে কাজ চালিয়ে নিতে হবে। ঘরে বসে হয়তো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির উৎপাদন বাড়ানো যাবে না, তবে স্কুল কলেজের পড়াশুনা বা অফিসের নথি ভিত্তিক কাজগুলো অবশ্যই করা যাবে। ডিজিটাল বাংলাদেশে এ ব্যাপারে নিশচয়ই সরকার সব ধরণের সহায়তা প্রদান করবে। কেস শনাক্ত করার জন্য সরকার এগারোটি বা তার বেশি টেস্ট সেন্টার দ্রুত স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সব সেন্টারে পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাস শনাক্ত করা হবে। এর সাথে স্বল্প মূল্যে, সহজে এবং দ্রুত করা যায় এমন অ্যান্টিবডি শনাক্তকরণ পদ্ধতি যুক্ত করা যায়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

দক্ষিন কোরিয়ান ট্রেস-টেস্ট-ট্রিট পদ্ধত্রির প্রথম ধাপ, ট্রেস করার ব্যাপারে আগেই বলেছি। আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা টেস্ট। পিসিআর কিট থাকলেও রোগীর কাছ থেকে নমুনা ঠিকমতো সংগ্রহ করে, তা থেকে আরএনএ বের করে আনা স্পর্শকাতর বিষয়। আমি যতদূর জানি, নাকের বা গলার নমুনা থেকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আরএনএ বের করে আনা কঠিন কাজ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা ম্যানুয়ালি অর্থাৎ হাতে ধরে করতে হয়। নমুনা যত বাড়বে, বায়ো সেফটি সমস্যার সাথে কন্টামিনেশন (দুষণ) ও ডেটা এ্নালাইসিস মাথাব্যাথা হয়ে দাঁড়াবে। আঠারো কোটি লোকের দেশে আইইডিসিআর কয়টি টেস্ট করে কি বলছে, তা নিয়ে অনেকে সোচ্চার হলেও টেস্ট এর রেজাল্ট এখন পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। তবে আরো এগারোটি বা তার বেশি টেস্ট সেন্টার দ্রুত স্থাপন করে, মলিকুলার বায়োলজির টেকনিকে অভ্যস্ত নয়, এমন লোকজনকে তাড়াহুড়ো করে টেনিং দিয়ে সেন্টার চালু করলে রেজাল্ট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। ইতমধ্যে চায়নীজ টেস্ট কিট এর রেজাল্ট প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। তবুও টেস্ট সেন্টার দ্রুত বাড়াতে হবে। ভুল হতে পারে, মানুষ মাত্রই ভুল করে, তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

অবশেষে হার্ড ইমিউনিটি অর্জন, যার কোন বিকল্প নেই। যেহেতু টিকা আবিষ্কৃত হয়নি, তাই বৃটেন প্রথমে বেছে নিয়েছিলে অর্জিত সক্রিয় হার্ড ইমিউনিটি পদ্ধতি। তার অর্থ এই নয় যে আমাদেরও সেলফ প্রোটেকশনে ছাড় দিয়ে স্বেচ্ছায় সংক্রমিত হতে হবে। পৃথিবীব্যাপী করোনার যে দুর্বার গতি, ঘনবসতিপূর্ণ এই দেশে অজান্তেই এটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। চীনে করোনা সংক্রমণের গতিপ্রকৃতির ধারণায়, ৮০% ক্ষেত্রে সংক্রমণের কোন উপসর্গ থাকবে না। থাকলেও হাল্কা হবে, বেশীর ভাগ আক্রান্তরা বুঝতেই পারবেন না যে ওটা ভয়াল ব্যাধি করোনা ছিল। ১৫% আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেও হোম আইসোলেশনে থেকে সেবা-শুশ্রষা পেলে সুস্থ হয়ে উঠবেন। তবে ৫% এর অবস্থা হবে সংকটজনক। এই প্রেক্ষাপটে হার্ড ইমিউনিটির গতি-প্রকৃতি জানা শুধু চিকিৎসক নয়, নীতি নির্ধারকদের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ।

সম্প্রতি একটি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ শেয়ার করি। করোনা ভাইরাস আতংকে ঢাকা থেকে রংপুরে ফিরছিলেন এক শ্রমজীবি ব্যক্তি। পথে শুরু হয় শ্বাসকষ্ট ও কাশি। করোনা ভাইরাস আতঙ্কে ভোররাতে তাঁকে ট্রাক থেকে ফেলে রেখে যাওয়া হয় বগুড়ার শিবগঞ্জের মহাস্থান বাসস্ট্যান্ডে। কারা ফেলে রেখে যান জানা যায় নি। তবে লকডাউন শেষ হলে তারা সবাই ঢাকায় ফিরবেন জীবিকার প্রয়োজনে। রংপুর থেকেই সাভার, গাজীপুরের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলতে ফিরবেন কয়েক লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ। এরা ফ্যাক্টরির আশেপাশের এলাকাগুলোতে মেস করে থাকেন, এক রুমে গাদাগাদি করে অনেকজন মিলে।

এবার, ঐ ঘটানাটা অন্যভাবে দেখার চেস্টা করি। ধরা যাক, শ্রমজীবি স্বল্প আয়ের ঐ ফেলে দেওয়া মানুষটি ঢাকায় তার এলাকার কয়েকজনের সাথে মেস করে থাকেন, রুম প্রতি চারজন করে। করোনা ভাইরাসের ভয়ে চার রুমমেট একসাথে ট্রাকে করে রংপুর রওনা হন। পথে একজনের শ্বাসকষ্ট শুরু হলো, অনবরত কাশছেন। নির্ঘাত করোনা, স্বয়ং মৃত্যদূত! বেশী দেরী করলে বাঁচার উপায় থাকবে না। তাকে ফেলে বাকী তিন জন রংপুর চলে গেলেন। যদি এমন হতো যে, রংপুর চলে যাওয়া তিনজনের অবস্থা ছিল তিন রকম। একজন ভাইরাস মুক্ত সুস্থ, একজন বর্তমানে আক্রান্ত তবে তাঁর কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি এবং তৃতীয় জন দুই সপ্তাহ আগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সেরে উঠেছেন, কোন উপসর্গ ছিলনা বলে তিনি বুঝতেই পারেন নি। যদি এই চারজন কোন উপায়ে আগে থেকে তাদের শারিরীক অবস্থা জানতে পারতেন, তাহলে কি করতেন? তৃতীয়জন সেরে উঠেছেন, তার অর্জিত সক্রিয় ইমিউনিটি আছে, তিন দ্বিতীয়বার আক্রন্ত হবেন না জেনে ঢাকাতে আক্রান্ত বাকী দুই জনকে নিয়ে থেকে যেতেন, তাদের দেখ-ভাল করতেন। এবং যিনি ভাইরাস মুক্ত, তাঁকে রংপুরে চলে যেতে বলতেন। বাস্তবে এরকম হলে, আমাদের আর চোখ ঝাপসা হয়ে আসা ঐ হৃদয় বিদারক সংবাদটি পড়তে হতো না। বাস্তবে এটা কিন্তু চেষ্টা করলে সম্ভব।

ইউরোপ আমেরিকায় হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে হইচই হচ্ছে, আমরাও সবাই দুচার কথা বলে অপেক্ষায় বসে আছি, কবে সেই হার্ড ইমিউনিটি আসবে। বসে না থেকে, আমাদের হার্ড ইমিউনিটি সার্ভে করা দরকার। গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা যাচ্ছে, ব্লাড গ্রুপ যে পদ্ধতিতে চিহ্নিত করা যায় সে রকম একটা পদ্ধতি তারা উদ্ভাবন করেছেন, ১৫ মিনিটে মাত্র ৩৫০ টাকায়। বোঝা যায় এর মূলে রয়েছে আইজি-

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

এম/আইজি-জি অ্যান্টিবডি শণাক্তকরণ পদ্ধতি। বিশ্বের অনেক দেশই এ ধরণের দ্রুত অ্যান্টিবডি শণাক্তকরণ কিট তৈরী করেছে। তবে অন্যদের অপেক্ষায় না থেকে আমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হতে হবে। অ্যান্টিবডি শণাক্তকরণ পদ্ধতি, পিসিআর পরীক্ষার মতো নির্ভুল ফলাফল দেবে না আর নির্ভুল ফলাফল না দিলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার ব্যবহার অনুমোদন করবে না। তবে সেই অনুমোদনের আশায় বসে থাকা কতোট যুক্তিসঙ্গত সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিছুদিন আগে দেখলাম, যুক্তরাষ্ট্রে কোন ট্রায়াল ছাড়াই সরাসরি মানব দেহে প্রয়োগ করে কোভিড-১৯ এর টিকা তৈরীর চেষ্টা চলছে। সেই প্রেক্ষাপটে অ্যান্টিবডি শণাক্তকরণ পদ্ধতি নির্ভুলের কাছাকাছি ফলাফল দিলেও তা বর্তমান সংকট উত্তরণে ব্যবহার করা যায়। এর আগে গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র অন্য একটি করোনা ভাইরাস শনাক্ত করার কিট উদ্ভাবন করেছে, যেটি ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের এ ধরণের অ্যান্টিবডি শণাক্তকরণ কিট উদ্ভাবন করার পথে। সর্বোপরি এর মূল উদেশ্য কমিউনিটি সেরোলজিক্যাল সার্ভে, ফাইনাল ডায়ানগসিস নয়। প্রয়োজনে এক সপ্তাহ পর টেস্ট রিপিট করা যেতে পারে। ফলাফল নিয়ে যাতে কোন হইচই না হয়, সে জন্য এটা সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রনে রেখে ব্যবহার করা যায়।

এই কমিউনিটি সার্ভে প্রান্তিক পর্যায়ে চৌদ্দ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও শহরের আরবান প্রাইমারি হেলথকেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে শুরু করা যায়। কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপিরা ডায়াবেটিস রোগীদের রক্ত পরীক্ষা করেন, এধরণের পরীক্ষা অনায়াসে শিখে নিতে পারবেন। সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচিতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে আছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জানেন টিকা কি। সবাইকে বোঝানো যাবে যে অদূর ভবিষ্যতে করোনা ভাইরাসের টিকা তৈরী হলে, প্রয়োজনে তা টিকাদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে। সার্ভে করা প্রয়োজন, কারণ যাদের অর্জিত সক্রিয় ইমিউনিটি আছে তাদের টিকা নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, অন্যদের টিকার মাধ্যমে আরোপিত সক্রিয় ইমিউনিটি তৈরী করে দেওয়া হবে। সর্বোপরি, সমগ্র জনসংখ্যার ৬০% কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে হার্ড ইমিউনিটি অর্জন না করা পর্যন্ত, কমিউনিট সার্ভে পাক্ষিক অথবা মাসিক কার্যক্রম হিসাবে চলমান রাখতে হবে। দেশের প্রান্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা সক্রিয় করে, তৃণমূল জনগোষ্ঠিকে এই যুদ্ধে সম্পৃক্ত করতে হবে। একাত্তরের প্রশিক্ষন হৃদয়ে ধারণ করে রণ-কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে আতংকিত পলায়নপর মানুষের সাহস।

কমিউনিটি সার্ভের মাধ্যমে যারা বুঝতে পারবেন নিজেদের অর্জিত সক্রিয় ইমিউনিটি আছে, তাদের ভয় কেটে যাবে। তারা আশেপাশে ভাইরাসে আক্রান্ত হোম আইসোলেশনে থাকা রোগীদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। গুরুতর অসুস্থ রোগীদের সম্ভাব্য ব্লাড-প্লাজমা থেরাপিতে তারা প্লাজমা ডোনার হতে পারবেন। তাছাড়া হার্ড ইমিউনিটি সার্ভের ফলফলের ভিত্তিতে ভৌগলিক সীমানা ও সময়ের ছকে লকডাউন সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। হার্ড ইমিউনিটি পর্যবেক্ষেনের এই মডেলটি আংশিকভাবে হলেও প্রয়োগ করতে পারলে বিশ্ব-দরবারে বাংলাদেশ সংক্রামক রোগ মোকাবিলায় এক নতুন রোল মডেল হিসাবে পরিচিতি পাবে।

লেখায় টেকনিক্যাল বিষয়গুলিকে সরলিকরণ করতে হয়েছে, যাতে সাধারণ পাঠক বুঝতে পারেন। স্বাধীনতা দিবসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। এখন আলোচনা সমালোচন চলছে,

আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
২৩ জুলাই, ২০২০

বিভিন্ন রণাঙ্গন নিয়ে বিচ্ছিন্ন অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বিজয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপকল্প দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। কবে নাগাদ বিজয় অর্জিত হতে পারে, সে ধারনাও অস্পষ্ট। যদিও যুদ্ধটা আমাদের নয় মাসে, অর্থাৎ আগামী শীতকালের আগেই জিততে হবে। আশা করা যায়, শীঘ্রই হয়তো কোন টিকা বা ঔষধ আবিষ্কৃত হবে। যদি নাও হয়, সুপরিকল্পিত ভাবে এগিয়ে গেলে আগামী ১৬ ডিসেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ের ঘোষনা দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

ডঃ শেখ আলীমুজ্জামান
জাপান প্রবাসী গবেষক, চিকিৎসক ও সংগঠক
sheikhaleemuzzaman.com